আনন্দবাজার পত্রিকা

২৬ অক্টোবর, ২০১৬

প্রবন্ধ ১

ঠিক কী ভাবছেন ট্রাম্পের সমর্থকরা

মৈত্রীশ ঘটক

বিদ্বেষ-উল্লাস। প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমর্থকদের ভিড়, ওহায়ো, ২২ অক্টোবর। এএফপি

আমেরিকার এ বারের নির্বাচনী পর্ব আক্ষরিক অর্থেই একটা রিয়ালিটি শো হয়ে দাঁড়িয়েছে, ব্যবসায়ী এবং প্রাক্তন রিয়ালিটি শো উপস্থাপক রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের কারণে। ট্রাম্পকে বিতর্কিত বললে কম বলা হয়। বিতর্ক শুধু মতাদর্শ বা প্রস্তাবিত নীতি নিয়ে নয়, বর্ণবিদ্বেষী উক্তি থেকে নারীনিগ্রহের অভিযোগ, ব্যবসায় চুক্তিভঙ্গ থেকে আয়কর ফাঁকি: প্রতি দিনই সংবাদমাধ্যমে টাটকা কেলেঙ্কারির কেন্দ্রে থাকছেন তিনি। তাঁর নিজের দলের একাধিক নেতাই তাঁকে রাষ্ট্রপতি পদের অযোগ্য বলে ঘোষণা করেছেন। নাট্যশাস্ত্রে হাস্য-ক্রোধ-ভীতি-অদ্ভুত ইত্যাদি যত রসের উল্লেখ আছে, প্রায় সব ক’টিরই মিশেলে প্রায়-অবাস্তব হয়ে দাঁড়িয়েছে পরিস্থিতি।

জনমত সমীক্ষায় ডেমোক্রাটিক দলপ্রার্থী হিলারি ক্লিন্টনের থেকে অনেকটা পিছিয়ে থাকলেও ট্রাম্প যে রাষ্ট্রপতি পদের জন্য এত দূর আসতে পেরেছেন এবং এখনও তাঁর জেতার সম্ভাবনা যে সম্পূর্ণ উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না, তার কারণ কী?

কারা ট্রাম্পের সমর্থক? কী কারণে তাঁরা এমন এক জন নেতার হাতে দেশ ও দশের ভার সঁপে দিতে প্রস্তুত? অর্থনৈতিক আখ্যান দিয়ে এই ধাঁধার খানিকটা বোঝা সম্ভব।

গত কয়েক দশকে আমেরিকায় শিল্পক্ষেত্রে মজুরি ও কর্মসংস্থানে ভাটা পড়েছে, যার মূল কারণ বিশ্বায়নের ফলে শ্রমের সন্ধানে চিনের মতো দেশে স্বল্প-মজুরির দেশে পুঁজির যাত্রা, আর প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ফলে কিছু ধরনের শ্রম-নির্ভর কাজের যান্ত্রিকীকরণ। তার সঙ্গে যোগ করতে হবে আয় ও ধনের ক্রমবর্ধমান অসাম্য, কারণ সাধারণ মানুষের আয়বৃদ্ধি না হলেও বিশ্বায়ন ও যান্ত্রিকীকরণের ফলে ধনীরা আরও ধনী হয়েছেন, এবং অর্থনৈতিক সচলতার সম্ভাবনাও ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়েছে। শ্রমজীবী ও নিম্নবিত্ত শ্রেণির কোন গভীর হতাশাবোধ তাঁদের ট্রাম্পের মতো রাজনীতিকের দিকে ঠেলে দিচ্ছে, সেটা বুঝতে গেলে তাঁদের আর্থিক অনটন এবং অর্থনৈতিক সচলতার অভাব, আর তার পাশাপাশি, অর্থনীতিতে ক্রমবর্ধমান অসাম্য, এই তিনটে উপাদানের মিশ্রণের রসায়ন বুঝতে হবে। অর্থনৈতিক দুরবস্থা সব সময়েই স্থিতাবস্থার বিরুদ্ধে এবং অবস্থাপন্নদের প্রতি বিক্ষোভ তৈরি করে। কিন্তু বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক সচলতার আশা, এই বিক্ষোভকে আংশিক ভাবে প্রশমিত করে। সমস্যা হয়, অসাম্য ক্রমবর্ধমান হলে। তখন 'আমরা' আর 'ওরা' এই শ্রেণি-দ্বন্দ্ব প্রবল হয়ে ওঠে, কারণ নিজে বা পরবর্তী প্রজন্মের কারওই অর্থনৈতিক সাফল্যের আশা থাকে না। আগের প্রজন্মের থেকে ভাল আছি, বা আমার অর্থনৈতিক অবস্থার খুব উন্নতি না হলেও আমার সন্তানেরা হয়তো ভাল করবে, এই সান্ত্বনাটুকুর অবকাশও তখন আর থাকে না।

বাণিজ্য, পুঁজির চলনশীলতা এবং অভিবাসন, বা আরও বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে অর্থনৈতিক উদারবাদ এবং বিশ্বায়নের প্রতি সাধারণ মানুষের মধ্যে যে প্রতিষ্ঠানবিরোধী বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠবে, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু প্রশ্ন হল, এই বিক্ষোভ বামপন্থী না হয়ে দক্ষিণপন্থী আন্দোলনের রূপ নিল কেন? বিভিন্ন জাতি আর ধর্মের শ্রমজীবী শ্রেণির মধ্যে ঐক্যবদ্ধ অসাম্য-বিরোধী আন্দোলন (যার নেতৃত্বে ছিলেন ডেমোক্র্যাটিক দলের প্রার্থী মনোনয়নের নির্বাচনে হিলারি ক্লিন্টনের প্রতিযোগী বার্নি স্যান্ডার্স) সফল হল না কেন? কেন তার বদলে সংখ্যাগুরু শ্বেতাঙ্গ শ্রেণির মধ্যে ট্রাম্পের মেক্সিকো-সীমানায় পাঁচিল তৈরির স্লোগান, মুসলিমদের দেশে ঢুকতে দেওয়া না দেওয়ার প্রস্তাব, কিংবা চিনের সঙ্গে কড়া হতে হবে এই ধরনের জাতিবিদ্বেষী (xenophobic), অভিবাসন-বিরোধী, এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী (isolationist) স্লোগানগুলি এত জনপ্রিয় হল?

এই হেঁয়ালি গভীরতর হয় যদি ট্রাম্পের প্রস্তাবগুলোর মূল বক্তব্য দেখি। তিনি নিজের দেশের বড় বড় কোম্পানিকে দাবড়ানি দিয়ে ঠান্ডা করে দিতে চান যাতে তারা আমেরিকার শ্রমিকদের চাকরি অন্যত্র পাচার না করে; চিনের মতো আমেরিকা যাদের সঙ্গে বাণিজ্যে লিপ্ত, সেই সব দেশের সঙ্গে এমন দরাদরি করতে চান যে তারা সুড়সুড় করে তাঁর সমস্ত শর্ত মেনে নিয়ে নতুন বাণিজ্য চুক্তি করবে; আর অন্য দেশের বিশেষত অশ্বেতাঙ্গ কাউকে আমেরিকায় ঢুকতে দেবেন না যাতে তারা চাকরির বাজারে ভূমিপুত্রদের পিছু না হঠাতে পারে, বা, আরও খারাপ সম্ভাবনার কথা ভাবলে, যাতে তারা অপরাধ আর সন্ত্রাসবাদের সমস্যা আরও না বাড়িয়ে তুলতে পারে।

রূপায়ণের কথা ভাবলে এই প্রস্তাবগুলো মোটেই বাস্তবসম্মত নয়। কংগ্রেস-সেনেট পার করে এই ধরনের নীতি পাশ করা সোজা কথা নয়। আর বাণিজ্য এবং অভিবাসন সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিলেও, দেশের পুঁজিপতিরা বেশি মজুরিতে দেশীয় অদক্ষ শ্রম নিয়োগ করবেন, এমন ভাবার কারণ নেই, বরং যান্ত্রিকীকরণ বাড়ার সম্ভাবনা, আর তার সঙ্গে জাতীয় পুঁজি স্থায়ী ভাবে দেশছাড়া হওয়ারও সম্ভাবনা। সাধারণ শ্রমিকদের ওপর বিশ্বায়নের কুফলের মোকাবিলা করতে কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের প্রসারের কথা, বিশ্বায়িত অর্থনীতি যে সুযোগ সৃষ্টি করে তার সদ্ব্যবহার করার ক্ষমতা শিক্ষাবিস্তারের মাধ্যমে নিম্নবিত্ত শ্রেণির মানুষের আয়ত্তের মধ্যে আনার কথা এবং এগুলোর খরচ জোগাতে বিত্তশালী শ্রেণির ওপর কর বাড়ানোর কথা স্যান্ডার্স বলেছেন, ক্লিন্টন খানিকটা হলেও বলছেন, ট্রাম্প একেবারেই বলছেন না। সাধারণ ভোটাররা তা হলে তাঁর বক্তব্য বিশ্বাস করছেন কী করে?

অর্থনৈতিক আখ্যানের এই হল সীমাবদ্ধতা। আসলে আমেরিকা বা অন্য কোনও দেশের ভোটাররা শুধু তাদের নিজস্ব অর্থনৈতিক স্বার্থে ভোট দিলে অনেক বেশি ‘বামপন্থী’ নীতি রূপায়িত হত, সেখানে পুনর্বন্টন এবং জনকল্যাণমূলক বিনিয়োগের বড় একটা ভূমিকা থাকত। সুতরাং এইখানে আসছে অন্য একটি আখ্যানের প্রাসঙ্গিকতা, যার মূলে আছে সত্তামূলক (identity) রাজনীতি, যা এই ক্ষেত্রে শ্বেতাঙ্গ জাতীয়তাবাদ, বা জাতিবিদ্বেষের রূপ নিয়েছে। জাতিবিদ্বেষ একাই ট্রাম্পের উত্থানের মূল কারণ হতে পারে না, কারণ ওবামা দুই দফায় প্রেসিডেন্ট হয়েছেন। কিন্তু ভোটারদের কোন সত্তা প্রাধান্য পাবে, অর্থনৈতিক না সামাজিক, তা নির্ভর করবে অর্থনৈতিক অবস্থার ওপরে। ওবামা শুধু নন, চার দশকের ওপরে কোনও ডেমোক্রাটিক প্রেসিডেন্ট প্রার্থী শ্বেতাঙ্গদের ভোটের গরিষ্ঠতা পাননি। কিন্তু শ্বেতাঙ্গ পুরুষদের (বিশেষত যাঁরা কলেজ-গ্র্যাজুয়েট নন) মধ্যে হিলারি ক্লিন্টনের তুলনায় ট্রাম্পের সমর্থনের হার ওবামার তুলনায় মিট রমনির সমর্থনের হারের থেকেও অনেকটা বেশি। এঁদের বুঝতে গেলে অর্থনীতির সঙ্গে আইডেন্টিটি বা সত্তা-মূলক আখ্যানটিকে মেলাতে হবে।

একটা উদাহরণ দিই। ভাবুন আপনি একটা বাসস্টপে দাঁড়িয়ে। যদি অনেক বাস আসতে থাকে, আশেপাশে কিছু বিজাতীয় মানুষদের প্রতি আপনার মনে প্রীতিমূলক ভাব থাক বা না থাক, আপনি নিজের যাত্রার দিকেই মন দেবেন। কিন্তু বাসের সংখ্যা যদি কমতে থাকে, তখন বাসস্টপে যাত্রীর ভিড় বাড়বে, আপনার হতাশা এবং রাগ উত্তরোত্তর বাড়বে এবং মনে মনে নিশানা খুঁজবেন কাউকে দোষী সাব্যস্ত করে পুঞ্জীভূত হতাশা উগরে দেবার। অপেক্ষমাণ সব যাত্রী যদি দৃশ্যত একই রকম হয়, তা হলে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া না করে তাঁদের ক্ষোভ বাসের সংখ্যা এত কম কেন এই দিকে গড়াবে। কিন্তু সেখানে যদি দৃশ্যত অনেক বহিরাগত যাত্রী থাকে, তা হলে সংখ্যাগুরু গোষ্ঠীর রোষ তাঁদের দিকে গিয়ে পড়বে। বাস যদি চাকরি বা অন্যান্য অর্থনৈতিক সুযোগের রূপক হয়, অর্থনৈতিক বৃদ্ধি এবং সচলতা যত কমে, অভিবাসীদের মতো দৃশ্যমান এবং শনাক্তযোগ্য গোষ্ঠীর দিকে আঙ্গুল তোলার প্রবণতা তত বাড়ে। সাদা চোখে জাতিগত পরিচয় যতটা ধরা পড়ে, অর্থনীতির মানচিত্রের ওলোটপালট ততটা পড়ে না। তাই অভিবাসী এবং ভিন্‌জাতীয়রা হয়ে দাঁড়ায় দেশের নানা সমস্যার ‘নন্দ ঘোষ’।

ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক অসাম্য রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি আস্থাহীনতা তৈরি করে। বাসস্টপের উদাহরণ ব্যবহার করলে, আপনি বাসে গেলেও কেউ কেউ গাড়িতে আরাম করে যাচ্ছে বলেই যে আপনার গায়ে লাগবে তা নয়, বরং স্বপ্ন দেখতে পারেন একদিন আমি নয়তো আমার ছেলেমেয়েরা আরাম করে গাড়ি চড়ে যাবে। কিন্তু যদি মনে হয় শুধু আপনি না, আপনার সন্তানকেও ভিড় বাসেই সারা জীবন যাতায়াত করতে হবে, তখন আপনার মনে হবে যারা গাড়ি হাঁকাচ্ছে তারা অন্যায় সুযোগ পাচ্ছে এবং সমস্ত ব্যাবস্থাটাই ক্ষমতাশীলেরা কুক্ষিগত করে রেখেছে। মূলধারার রাজনৈতিক নেতৃত্বের ভাল প্রস্তাবও তখন বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। যে শ্বেতাঙ্গ শ্রমজীবী পুরুষরা ট্রাম্পের সবচেয়ে বড় সমর্থক, তাঁরাই যে কোনও সরকারি কল্যাণমূলক প্রকল্পের (যেমন, ওবামাকেয়ার) সবচেয়ে বড় বিরোধী এবং তার একটা বড় কারণ হল, অভিবাসী ও সংখ্যালঘু মানুষরাও এই সব প্রকল্পের সুযোগ পাবে।

সত্তামূলক রাজনীতির মধ্যেও লুকিয়ে আছে তার নিজস্ব দ্বন্দ্ব। সত্তা তো শুধু বর্ণ, জাতি বা ধর্মের ভিত্তিতে হয় না, লিঙ্গও তার একটা গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা। শ্বেতাঙ্গ পুরুষদের মধ্যে তাঁর জনপ্রিয়তা প্রবল হলেও, যদি ট্রাম্প হারেন, তিনি হারবেন মূলত শ্বেতাঙ্গ নারীদের জন্যে (যাঁরা অনেকেই রিপাবলিকান), নানা নারীবিদ্বেষী কথা ও আচরণে যাঁদের সমর্থন তিনি অনেকটা হারিয়েছেন। কারণ, মহিলারা জনসংখ্যার অর্ধেক, এবং তাঁদের মধ্যে ভোটদাতাদের হার বেশি। মারি ল্য পেনের মতো কেউ থাকলে, কী হত বলা যায় না।

লন্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স-এ অর্থনীতির শিক্ষক